চিহ্নতত্ত্বের আলোকে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য

তত্ত্ব কখনো কখনো আমাদের চশমা উপহার দেয়; কখনো-বা আরও একটু উপযাচক হয়ে রঙতুলি হাতে আমাদের চোখদুটিকেই তা এঁকে নেয় চুপি চুপি। উল্টোপিঠে কখনো আবার আমাদের চোখই নিজের প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী তত্ত্বকে খুঁজে নেয়, তাকে আহরণ করে ফুলন্ত প্রশাখা থেকে, বীজ থেকে, প্রেম ও প্রকৃতির দ্বিরালাপ থেকে তার নির্যাস টেনে আনে চেতনার গহনদেশে অন্ধলোকের নির্জনতায়। তখন তা আর নিছক খড়বোঝাই গোরুর গাড়ি হয়ে থাকে না; ধানের খেতে বাতাস হয়ে, আকাশ-চুঁয়ে-পড়া রোদ ও জ্যোৎস্না হয়ে তা আমাদের সত্তার সঙ্গে মিশে যায়, আমাদের চোখকে পূর্ণতা দেয়, আমাদের জীবনকে জাগিয়ে রাখে। মনে হয় তা যেন আমাদেরই কথা, আমাদেরই হৃদয়ের ভাষা হয়ে তা এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিল আমাদের প্রাত্যহিকতায়, পলাশের বনে, পাঠে ও পাঠান্তরে। আসলে, চিহ্ন ও চেনা— এই দুটি বিষয় ধ্বনিগতভাবে অনেকখানিই ঘনিষ্ঠ, বলা চলে। আর চিন্তনও তা-ই। কিন্তু শুধু ধ্বনিগত বা উচ্চারণগতভাবেই নয়, এদের মধ্যে কোথাও যেন এক প্রচ্ছন্ন দার্শনিক যোগও পরিলক্ষিত হয়। কাকে চিনব? কাকে চিনছি? চারপাশের পৃথিবীকে? আর নিজের মনের জগতটিকেও বুঝি! গাছ থেকে শুরু করে গতিসূত্র, মাছ থেকে শুরু করে মতিভ্রম, কাছ থেকে শুরু করে দূরবর্তী টিলা, সবকিছুই তো আমরা পৃথকভাবে কোনো-না-কোনো উপায়ে চিনতে শিখছি ছোটোবেলা থেকে বা চিনতে থাকবও বুড়োবয়স অবধি। এই চেনার পিছনে যে চিন্তন, তা-ই কি আসলে চিহ্ন নয়? কিন্তু এই চেনা কি অতই সহজ বিষয়, যতখানি সহজ আমরা ভাবি? আর এই 'চেনা'র ভিতর রয়েছে যে 'বোঝা', তার বোঝাও কি যথেষ্ট ভারবহুল নয়? 'শুক' বললে আমরা না-হয় সবাই টিয়াপাখি বুঝলাম, কিন্তু 'সুখ' বললে আমরা কী বুঝব? তবে কি আপেক্ষিকতা এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে 'চেনা-বোঝা'র চেহারা? এমনকি 'শুক' বললেও সবার মনে যে টিয়াপাখির ছবি ভেসে উঠবে, তাও দেখতে সদৃশ হলেও কার্যত একটিই পাখি নয়। অভিজ্ঞতার তারতম্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য সেখানেও থেকেই যাবে। আর কারো চোখে যদি চন্দনা পাখি বসে থাকে? আর উল্টোদিকে সুখের যে বৈচিত্র্য জোগাড় হবে, তা নিয়ে কিছু না-বলাই আপাতত ভালো। আলাদা আলাদা মানুষের আলাদা আলাদা মতি; তাই 'মত'ও নানা মুনির নানা রকম। কিন্তু 'মুনি' মানে তো 'মৌনী', তা-হলে তাঁদের মতামতটুকু প্রকাশ পাবে কী করে? মতপ্রকাশের মূল মাধ্যম তো ভাষা, মৌখিক ভাষা। লিখে বোঝাবেন কি? সেক্ষেত্রেও মৌখিক ভাষার বিকল্প হিসেবে নতুন কোনো চেনার উপায়ের প্রয়োজন— অর্থাৎ লিপির প্রয়োজন। অথবা ধ্বনি ও লিপি— এই দুয়ের কোনোটিরই সাহায্য না নিয়ে মতপ্রকাশ করতে চাইলে আরও অন্য কোনো ভাবভঙ্গিমার প্রয়োজন। এবার ধরা যাক, যাঁরা মুনি নন, এবং যাঁরা একই

সমাজব্যবস্থা ও মাতৃভাষাগোষ্ঠীর অংশ, তাদের ক্ষেত্রে কি এই চেনাবোঝার বিষয়গুলি সহজ হবে? হ্যাঁ, সহজ নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সুনিশ্চিত হবে কি? সেখানেও ভাষা, ভঙ্গি, যে বলছে, যে শুনছে, প্রেক্ষিত বা পরিস্থিতি, সবকিছু মিলে এক জটিল বহুমাত্রিকতা তৈরি করবেই। ক্লাস এইটের একটি ছেলেকে যখন দিদিমণি দেখে বলেন 'বাড়ন্ত বাচ্ছা', তখন তার মন এই ভেবে খুশি হয় যে সেও বাড়তে বাড়তে শিগগির বড়োদের মতো হয়ে উঠবে; কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন ঠাকুমা-র মুখে শোনে 'চাল বাড়ন্ত' আর সে চালের ডাব্বায় উঁকি দিয়ে দেখে, চালের পরিমাণ শেষ দু-দিনে পাত্রের আধভাগ থেকে কমে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, তখন সে ঠাকুমা-র কথার মানে বুঝতে গিয়ে একটু ধন্দে পড়ে যেন। অথচ নেহাত সে যে অবুঝ, তাও নয়। মা যখন রাগী-রাগী মুখে চোয়াল শক্ত করে বলে, "দাঁড়াও, খেলতে যাওয়াচ্ছি তোমায়!"— সে তখন দিব্যি বোঝে যে সেই মূহূর্তে তার খেলার সাধটুকু কতখানি দুর্গম হয়ে উঠতে চলেছে। কিংবা 'আজ ভারতের ম্যাচ আছে' বললে সে ভারতের ক্রিকেট-দলের খেলাই বোঝে, কোনোরকম মাথার কসরৎ ছাড়াই। কিংবা সিঁড়িতে খটখট শব্দ পেলে সে বোঝে, বুট পরে কেউ ওপরে উঠে আসছে, এমনকি তখন ঘড়িতে সন্ধে আটটা বাজলে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে সে এও বোঝে যে, আর কেউ নয়, তার বাবাই অফিস থেকে ফিরছে। আবার সিরিয়াল বা সিনেমায় যখন কেউ বলে 'আইনের হাত অনেক লম্বা', সে ভাবে— 'কত লম্বা', 'সেই রাক্ষুসির গল্পে রাক্ষুসিটা যেমন দাওয়ায় বসে হাতটা অনেকখানি লম্বা করে পাতিলেবু পাড়ছিল, সেইরকম লম্বা কি?' অথবা পাড়ার মোড়ে যাদবকাকার চায়ের গুমটি ভেঙে সেখানে মুখার্জিদের মোবাইলের দোকান বসে গেলে, যাদবকাকা যখন থানায় নালিশ জানিয়েও কোনো ফল পায় না, আর লোকে বলে, "এর পেছনে MLA-রও হাত আছে", তখন কি ছেলেটা ভাবে, 'MLA-এর বাড়ি তো অনেক দূরে, তাহলে সেই MLA-এর হাত আরও কত লম্বা'? কিংবা মুদিখানার দোকানে ভোটের ফলাফল নিয়ে কথা হলে কেউ যখন শ্বশুরবাড়ির এলাকার খবর জানানোর জন্য বলে, "ওদিকে তো গোরুতে সব ঘাস মুড়ো করে খেয়ে নিয়েছে", তখন সে কি অবাক হয়? নাকি আর পাঁচজনের হাসিতে সেও না বুঝে যোগ দিয়ে ফেলে? এ তো গেল আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষার সংকট। আর সাহিত্য? সাহিত্যের ভাষাকে চেনার প্রক্রিয়াটি ঠিক কীরকম? সাহিত্য মানে তো সহিতত্ব। অর্থাৎ সংযোগ বা মিলনও বলা যায়। কীসের সঙ্গে কীসের মেলামেশা? যা বলা বা লেখা হয়েছে, আর যা শোনা বা পড়া হয়েছে— এই দুয়ের? বলা আর শোনার মধ্যে, লেখা আর পড়ার মধ্যে যে চেনা বা বোঝার প্রক্রিয়া, তা-ই তো এই দুয়ের মিলন। অর্থাৎ চেনার প্রক্রিয়াই কি সাহিত্য? অর্থাৎ চিহ্নই সাহিত্য? তা-হলে আমাদের রোজকার ব্যবহারিক ভাষাতেও তো চিহ্ন তথা চেনার প্রক্রিয়াটুকু জ্যান্ত রয়েছে, তাকে কেন আমরা সাহিত্য বলি না। সম্ভবত সহিতত্বের মাত্রা ও গভীরতার কথাই বলা হবে। তা হোক,

সেই তর্কে না গিয়ে আমরা আপাতত বোঝার চেষ্টা করি, সাহিত্যে বা সমাজে এই চেনাচেনির তথা চিহ্নায়নের চরিত্র কেমন। এইসূত্রে আবার আসবে চিন্তনের কথা। 'চিন্তন' কী? জটিল প্রশ্ন। বহু লোক তা নিয়ে ভেবেছেন। অর্থাৎ 'চিন্তা' নিয়েও চিন্তা করেছে মানুষ। যেমন চেনাচেনির চরিত্র চেনার ব্যাপারে অর্থাৎ 'চিহ্ন' নিয়েও চিন্তা করেছেন বহু চিন্তক। আমরাই বা এই জটিল বিষয়টিকে কী চোখে চিনতে চাইব? 'শুক' বলতে আমিও কি টিয়াপাখিই বুঝব? নাকি আমারও চোখের কোটরে চুপি চুপি চন্দনা ঢুকে বসে আছে?

সেই খোঁজে এগিয়ে গেলে দেখা যায়, সুইস ভাষাতত্ত্ববিদ ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুরের (১৮৫৭-১৯১৩) সম্পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নসংক্রান্ত ধারণাটিকে (*Course in General Linguistics,* ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত) পরবর্তীকালে রঁল্যা বার্ত (১৯৫৭ সালে তাঁর *Mythologies* বইটির 'Myth Today' অংশে) যেভাবে সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় মুক্তি দিলেন, তাকে ভিত্তিভূমি হিসাবে ধরেও পাদপীঠ হিসেবে গ্রহণ করা চলে, চার্লস স্যান্ডারস পার্স (চিহ্নবিজ্ঞানের আমেরিকান ঘরানার অন্যতম মধ্যমণি) চিহ্নের যে বর্গীকরণ করেছেন, তার কাঠামোটিকে। বিশেষত পার্সের বর্গীকরণের একটি পর্যায়কে স্যসুরের তত্ত্বের সাপেক্ষে গ্রহণ করে, তারপর সেই শ্রেণিবিভাজনকে (symbol, icon, index) নিজস্ব দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী একটু বর্ধিত করে নিয়ে ('icon' বা প্রতিমাকে 'মূর্ত' ও 'ভাবসাদৃশ্যগত'— এই দুটি ভাগে, আর 'index' বা নির্দেশককে 'প্রতিনিধিত্বমূলক' ও 'কার্যকারণগত'— এই দুটি ভাগে), এ-পথে একরকম করে এগোনো সম্ভব। প্রাচ্য ধ্বনিবাদীদের বিশেষ 'ধ্বনি'র ধারণা ও ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত এইসংক্রান্ত নানারকম তুল্যমূল্য বিষয়কেও তুলনামূলকভাবে একটু অন্বিত করে নেওয়ার চেষ্টা চালানো যেতে পারে। এ-ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে গ্রামসিকথিত সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ, বাখতিনকথিত দ্বিবাচনিকতা ও দেরিদাকথিত বিনির্মাণতত্ত্বের প্রসঙ্গও অল্পস্বল্প উড়ে এলে ক্ষতি কী!

আর সেই নিরিখেই, প্রাচীন লোককথা থেকে আধুনিক কথাসাহিত্য অবধি যাত্রাপথের সম্ভাব্য সমাজতাত্ত্বিক ধর্মগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে শনাক্ত করা চলে। ১. একটি প্রথা, ফলিত কুসংস্কার ও প্রতিমার নির্মাণ (আদিম মানুষের একটি জাদুক্রিয়ামূলক সংস্কার কীভাবে তার টোটেম-সম্পর্কিত প্রতীকভাবনাকে অতিক্রম করে, তাকে বিমূর্তায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তখনও অবধি তাকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের উপরেই)। ২. নীতিকথার উদ্ভব, লেখকের জন্ম ও রূপকের বাস্তবতা (যখন সামাজিক অনুশাসনগুলি সুদৃঢ় হচ্ছে ক্রমশ, তখন পশুকথাই কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে নীতিকথায়, প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নের মধ্য থেকে আহরিত হচ্ছে রূপক, এবং সেই কর্তৃত্বময় 'লেখক'-এর জন্ম হচ্ছে পরবর্তীতে বার্ত যার মৃত্যুর আর্জি আনবেন)। ৩. রূপকথার বিকাশ (কোন্ সাংস্কৃতিক পরিসরে বিকাশলাভ করল

রূপকথা, কীভাবে তা হয়ে উঠল নিম্নবিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীজয়ের ঔপনিবেশিক স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার বিনির্মাণ, কোন্ সমীকরণে তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে মিশে গেল সুখী স্থিতিশীল গৃহকোণের মায়া ও শুভবোধের সংযম)। ৪. পাল্টা রাজনীতি, রোমান্সের বীজ, লেখকের স্বৈরতন্ত্র (রোম্যান্সকে রূপকথার একটি বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী পর্যায় হিসেবে কতটা চিহ্নিত করা সম্ভব, কীভাবে তাতে রূপকের ভাষা ক্রমশ স্থানান্তরিত হতে হতে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের প্রাধান্য দেখা গেল, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে কোন্ বিশেষ চিহ্নের রাজনীতি)। ৫. প্রতিনিধির ভিড়, বণিকতন্ত্র ও আধুনিকতার স্বরূপ (ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র-প্রসূত পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক চিহ্নচেতনা কীভাবে এক নতুন আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্মাণ করছে, যার গর্ভে লালিত আজকের ছোটোগল্প ও উপন্যাস, যা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের একচেটিয়া প্রয়োগকে অবলম্বন করে গড়ে উঠছে, রূপকের ভাষা হয়ে উঠছে প্রান্তিক প্রলাপ মাত্র)।

এরপর নির্বাচিত কিছু কথাসাহিত্যের নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনার বিভিন্ন জটিল মাত্রাকে এইসব গৃহীত ও প্রস্তাবিত পরিভাষার ধারণা দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টাও মন্দ হবে না। যেমন ধরা যাক, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে লোকায়ত রূপকধর্মিতা কীভাবে বয়ানের বহুমাত্রিকতা ফুটিয়ে তুলছে, এইসব আর কি। এই প্রকল্পে মূলত *কঙ্কাবতী* উপন্যাসটিকেই প্রাধান্য দিয়ে, পাশাপাশি প্রসঙ্গসূত্রে 'লুল্লু' ও 'ডমরুধর'-এর আখ্যান থেকেও উদাহরণ ব্যবহার করে, বিষয়টি দেখা যেতে পারে। প্রতিতুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন লেখার আলোচনাও হয়তো আনা যায়, কিন্তু অহেতুক জটিলতা এড়াতে সেই পরিসরসাপেক্ষ বিতর্কগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পসাহিত্য ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া সম্ভব বস্তু ও ব্যঞ্জনার সমঝোতামূলক সহাবস্থান, দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতার দ্বন্দ্ব ও সেই দ্বান্দ্বিকতার একটি উল্লেখযোগ্য শুভপরিণাম। এমনকি, চাইলে, এই রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে রূপক ও নির্দেশকের নানাবিধ ব্যঞ্জনাকে মোটামুটি ছয়টি চালচলনে বর্গায়িত করাও যেতে পারে। ১. রূপক যেখানে প্রকট ও প্রবচনধর্মী (খুব প্রথাগত ছাঁচে লেখক কোনো-না-কোনো প্রাচীন, প্রচলিত বা বহুকথিত চিহ্ন-সূচকের প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন কোনো বিশেষ বক্তব্যকে পেশ করতে গিয়ে, যদিও সেখানে অতিশয়োক্তির আড়ালটুকু থাকছে, কিন্তু আখ্যানের পরিপুষ্ট রূপকধর্মিতা পাঠকের অগোচর থাকছে না কোনোভাবেই, কারণ পাঠকের বহুযুগব্যাপী ব্যঞ্জনাবোধের সঙ্গে তা সংযুক্ত ও সাযুজ্যপূর্ণ, যেমন 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-তে অঙ্কিত দ্বৈপায়ন তাসের রাজ্য বা তাসরমণী, *লিপিকা*-র 'তোতাকাহিনী'-তে বর্ণিত তোতাপাখিটি, কিংবা 'কর্তার ভূত' গল্পে 'ভূতুড়ে জেলখানা', অথবা সমাজরূপ পেষণযন্ত্র বা উৎপাদনযন্ত্র হিসেবে উল্লিখিত ঘানি, *গল্পসল্প*-এর 'বড়ো খবর' শীর্ষক পরিচ্ছেদে পাল ও দাঁড়ের দ্বন্দ্ব, নৌকা, এমনকি নৌকার মাঝি অবধি, *সে*-তে শিবুনাথ শেয়ালের আখ্যান কিংবা দুইপ্রকার বাঘের বৃত্তান্ত), ২. রূপক

যেখানে সটীক ব্যাখ্যাধর্মী (প্রযুক্ত রূপকের ব্যাখ্যাটিপ্পনী, যেমন, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে 'শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘট' যে বৈদ্যনাথের জীবনদৃষ্টির তাৎক্ষণিক শূন্যতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক ভগ্নদশারই উপমান, তা লেখকের নির্দেশমাফিক আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, অথবা 'সমাপ্তি' গল্পের সূচনায় বর্ণিত আকাশ ও নদীর প্রফুল্লতা যে আসলে অপূর্বকৃষ্ণের মানস-পরিস্থিতিরই দ্যোতক, তাও লেখকের তৎপরতায় পরক্ষণেই আমরা অর্বাচীনেরা উপলব্ধি করতে সফল হই), ৩. প্রচ্ছন্ন রূপক (আপাত যে বস্তুগত কাহিনিকথন, তার মধ্যেই ছড়ানো-ছিটানো নানান রূপকব্যঞ্জনাধর্মী বয়ান— যা সুপ্ত, যা নিঝুম প্রোথিত, পাঠকের বিনির্মাণপন্থী খননক্রিয়ায় স্বতন্ত্ররূপে অনুধাবনযোগ্য ও বিতর্কমূলক, অর্থাৎ আপাত একটি আভিধানিক আলাপনে, প্রতিনিধিত্বমূলক পরিসরের ভিতর, লুক্কায়িত কোনো রূপকভাষ্যের প্রবালদ্বীপ, যেমন, 'দুরাশা' গল্পে যমুনার নির্জন খেয়াঘাটে কেশরলালের নিরালা জীর্ণ নৌকা অথবা 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে 'সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের' মধ্য দিয়ে চলা শশীভূষণের নৌকা, 'মহামায়া' গল্পে মন্দিরের 'অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট' কিংবা ভাঙা ঘাটের সোপানে নদীর জলের ছন্দোময় আঘাতের ধ্বনি, প্রতিকূল ঝড় কিংবা উড়ন্ত কাঁকর, 'নষ্টনীড়' গল্পে অমলের মশারির ওপর কারুকাজ রাখার বাসনা, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের প্রদীপ-নেভা অন্ধকার, অথবা আরও একটু বিতর্কিতভাবে 'সমাপ্তি' গল্পে মহাজনী ইঁটের পাঁজা বনাম কাদার পিচ্ছিলতা ও 'পণরক্ষা' গল্পের বাঁশঝাড়ের বর্ণনা প্রভৃতি), ৪. প্রত্নপ্রতীকের পুনর্গঠন (একটি কোনো পরিচিত প্রতীকভাবনা, যেটিকে ভেঙেচুরে নতুন পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হচ্ছে, বিশেষরকম বিকল্পায়নের মধ্য দিয়ে তাকে নতুনতর তাৎপর্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে, যেমন, *লিপিকা*-র 'সুয়োরানীর সাধ', 'রাজপুত্তুর', 'ভুল স্বর্গ', 'পরীর পরিচয়' প্রভৃতি), ৫. প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব (শৈলীগতভাবে সেই বিশেষ যুক্তিবিভ্রম— যেখানে কোনো বিশেষ ফলাফলের পূর্বপ্রান্তে প্রযুক্ত অথবা নিম্নতলে নিযুক্ত প্রধান বা প্রকৃত কারণটিকে শনাক্ত করতে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে, বা তাকে বলপূর্বক উপেক্ষা করে, অন্য কোনো ছদ্ম বা গৌণ কারণকে উপস্থাপন করা হয়, *সে* শীর্ষক গ্রন্থটির 'গেছো বাবা' অংশটি), ৬. বিমিশ্র বা অবর্গীকৃত ব্যঞ্জনা (যেগুলিকে হয়তো উপরের কোনো গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত সেভাবে করা যাবে না, কিছু বিমূর্ততার বাস রয়ে যাবে, গোলাকার কোনো অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো কার্যত কঠিন, কিংবা একাধিক পরিকাঠামো উদ্ভটভাবে মিলেমিশে যাবে)। পাশাপাশি জগদীশ গুপ্তের গল্প থেকেও কয়েকটি সূত্র স্বল্পকথায় সেরে দেওয়া যেতে পারে। এ-ছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখের কিছু কিছু গল্পকে আমরা খাপছাড়াভাবে বেছে নিয়ে, আর সেইসাথে আরেকটু তাত্ত্বিক উৎকর্ষ অনুধাবনের জন্য, পৃথকভাবে পর্বটির দ্বিতীয় খণ্ডে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যের মধ্যেও পূর্বালোচিত সম্ভাবনাগুলি বুঝে নেওয়া যেতে

পারে। কিংবা আরও পরে হয়তো পেয়ে যাব গল্পহীনের গল্পকুহক। বয়ানের কুটিল বিক্ষোভ ও ব্যঞ্জনার ক্রূর বিমিশ্রতা বুঝে নিতে বিমল কর, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুব্রত সেনগুপ্ত, নবারুণ ভট্টাচার্য, সুবিমল মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প থেকে উদাহরণ জোগাড় করে দেখা যেতে পারে। যেমন— এই পর্যায়ে লেখকেরা প্রচলিত ঘটনামূলক গোলাকার গল্পকাহিনি পরিবেশনের বিরুদ্ধে নানাভাবে নানারকম প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রচেষ্টা করেছেন, আর সেই প্রচেষ্টার ছাপ তাঁদের শৈলী বা লিখনভঙ্গির মধ্যেও পড়েছে। বহু লেখকের বহু গল্পে প্লটবিচ্ছিন্ন খাপছাড়া ঘটনাস্রোত চিহ্নের ভিন্নতর ব্যঞ্জনার মাত্রাকে খুঁজে নেওয়াই হবে আমাদের কাজ।

সেক্ষেত্রে শেষ অবধি হয়তো দেখা যাবে যে, চিহ্নের অমিয় সম্ভাবনা আমাদের দৈনন্দিন যাপন ও যোগাযোগের ভিতরেই প্রতিনিয়ত জন্মাচ্ছে আবার প্রতিনিয়ত মৃত্যুমুখে পতিতও হচ্ছে। বস্তুত চিহ্নের ধর্মই এই, কিন্তু এই নিরন্তর সৃষ্টি ও ভাঙনের মধ্য দিয়েই ভাষা বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে সাহিত্যও। একই চাঁদ কখনো প্রেমিকের চোখে হয়ে উঠছে প্রিয়ামুখ, কখনো ক্ষুধিতের চোখে হয়ে উঠছে 'ঝলসানো রুটি'; কিন্তু চাঁদ শুধু চাঁদ হয়েই থাকলে সে মরে যেত। সেই কোন্ প্রাচীনকালে মানুষ প্রতীক ভেঙে রূপকের জন্ম দিয়েছে, পশুকথা ভেঙে নীতিকথা, কখনো আবার নিজেদের প্রয়োজনেই রূপকের বিমূর্ততা মুছে ফেলে নিটোল ভাবমূর্তি গড়ে নিতে চেয়েছে, রূপকের বদলে এসেছে বিশেষ প্রতিনিধির দল, রূপকথাকে ক্রমশ কোণঠাসা করে রাজত্ব শুরু করেছে রোমান্স, আবার তাকেও দেখতে দেখতে সরে যেতে হয়েছে, জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে আধুনিক উপন্যাসের জন্য, এইভাবে নীতিকথার ঘাঁটিও দখল করে নিয়েছে আধুনিক ছোটোগল্প। আবার প্রতিনিধিবর্গকেও পড়তে হল দ্বান্দ্বিকতায়, রূপকের হারানো জমি কিন্তু-কিন্তু করে কিছু অন্তত ছাড়তেই হল। রূপকচিহ্নেরাও এখানে-সেখানে ঘাড় গুঁজে উদ্‌বাস্তুর মতো টিকে গেল প্রচ্ছন্ন চেহারায়। ধীরে ধীরে আখ্যানের আঙিনায় হৃত সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য আজও তারা মুখিয়ে রয়েছে প্রত্যাশায়, প্রলোভনে। কার্যত, জীবন যত বেশি বৈচিত্র্যের দিকে ঝুঁকতে থাকবে, দ্বিবাচনিক সম্পর্কগুলি হতে থাকবে ক্রমশ জটিল, ততই প্রাত্যহিক বয়ানে নিবিড় ব্যঞ্জনাময়তার প্রয়োজন হবে; নিছক একমাত্রিক ঘটনাবৃত্তান্তে আর মনন তৃপ্ত হবে না, বস্তুত কোনোদিনই হয়নি, জীবনের ভাষা রূপকধর্মিতাকে অবলম্বন করে চিরকালই বেঁচে আছে। রয়েছে জটিল অন্তঃসলিলা নির্দেশকের নিবিড়তম চলাফেরাও।

দিব্যেন্দু দলুই